মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তার সন্ধানে

ফরিদ আহমেদ

মানব সভ্যতা বিকাশের বহু বহু আগে সুপ্রাচীন কালে কোন এক শ্বেতশুভ্র মায়াবী পুর্নিমা রাতে হয়তো আমাদেরই কোন এক পুর্বপুরুষ অসীম কৌতুহল নিয়ে মাথা তুলে তাকিয়ে ছিল সুবিস্তৃত আকাশের অনন্ত নক্ষত্রবীথির দিকে । অপরিনত বুদ্ধিমত্ত্বা আর সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছিল সৃষ্টির অপরিসীম রহস্যকে। রহস্যের কূল কিনারা করতে পারুক আর নাই পারুক, দুর্দমনীয় এই কৌতুহলকে আমাদের সেই পুর্বপুরুষ খুব সফলভাবেই ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। আদি পুরুষের সেই অনুসন্ধিৎসা উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ এখনো বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আজন্ম তার রক্তের মধ্যে। তাই হয়তো অজানাকে জানা আর রহস্য উন্মোচনে মানুষ দুর্দমনীয়, ক্লান্তিহীন। নাছোড়বান্দার মতো সৃষ্টির আদি এবং অন্তকে ছিড়ে খুঁড়ে ব্যবচ্ছেদ করার অদম্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে নিরন্তর। কোথা থেকে বিশ্বজগতের সূত্রপাত আর কোথাই বা শেষ, কোন অমর্তলোকে সৃষ্টি আমাদের, কেনই বা আমরা এই পৃথিবীতে, কিই বা এর উদ্দেশ্য এহেন হাজারো কৌতুহল আর উত্তরহীন জিজ্ঞাসা মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে শতাব্দী থেকে শতাব্দী। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষ যখনই জেনেছে যে, রাতের আকাশের আলোকরাজী আর কিছুই নয় বরং আমাদের সুর্যের মতোই অগুণতি সুর্যের সমাহার, তখনই সচেতনভাবে মানুষের চিন্তায় এসেছে, অনন্ত অসীম এই মহাবিশ্বে তাহলে কি শুধু আমরাই আছি। নাকি আমাদের দৃষ্টি এবং বোধসীমার বাইরে সুবিস্তৃত বিশ্বজগতের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমাদেরই মতো বা আমাদের চেয়েও উন্নত অসংখ্য সভ্যতা।

মেঘহীন পরিষ্কার আকাশে খালি চোখে আমরা মাত্র কয়েক হাজার নক্ষত্র দেখতে পাই। যা প্রকৃত সংখ্যার অতি নগন্য অংশ মাত্র। শুধুমাত্র আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথেই নক্ষত্রের সংখ্যা চারশ' বিলিওনের মতো। হাবল মহাকাশ টেলিস্কোপের মাধ্যমেই পঞ্চাশ থেকে একশ' বিলিওন ছায়াপথ পর্যবেক্ষন করা সম্ভব। সুবিশাল এই মহাবিশ্বের অনন্ত নক্ষত্রমালার কোন কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকাটা আর যাই হোক না কেন অসম্ভব যে নয় তা যে কোন একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝবে। বিজ্ঞানীদের মতে, প্রাণ প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ যা অনুকুল পরিবেশ পেলেই বিকশিত হয়ে উঠে। সৃষ্টির পর তুলনামুলকভাবে খুব কম সময়েই পৃথিবীতে 'প্রাণ' তার আগমনী সংগীত গেয়েছে। কাজেই একই ধরনের পরিবেশ পেলে, যে সমস্ত নক্ষত্র আমাদের সুর্যের মতো সেগুলোর গ্রহতেও প্রাণের বিকাশ ঘটা খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়।

বিপুলা এই মহাবিশ্বে আমরাই একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী নাকি আরো কেউ আছে, এই জিজ্ঞাসার উদ্ভব অনেক আগে হলেও সত্যিকার অর্থে এর উত্তর খুঁজে পাওয়ার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। ষাটের দশকের শুরুতে রেডিও সিগন্যাল সনাক্ত করার মাধ্যমে মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্ত্বা সন্ধানের জন্য যাত্রা শুরু হয় SETI -র (The search for extraterrestrial intelligence). এই অনুসন্ধানে বিজ্ঞানের কোন বিশেষ শাখা এককভাবে কাজ করছে না। সম্মিলিতভাবেই চলছে মহাজাগতিক বুদ্ধিমান প্রাণী খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা। এমনকি বিজ্ঞানের বাইরে দর্শনশাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞানও SETI কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। সামান্যতম অবদান রাখতে সক্ষম যে কেউই হতে পারে এই প্রচেষ্টার অংশ। বৈজ্ঞানিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা যে কোন সাধারণ লোকও বাড়ীতে বসেই অংশ নিতে পারে SETI গবেষনায়।

প্রাণীসত্ত্বার বিবর্তনের এক অগ্রসরমান ধাপ হচ্ছে বুদ্ধিমত্ত্বা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্ত্বা কি তা নিয়ে একমত হওয়া কঠিন। প্রয়াত বিজ্ঞানী আইজাক আসিমভ অভিমত প্রদান করেন যে, কোন একক প্রাণীর বুদ্ধিমত্ত্বা নয় বরং সমগ্র প্রজাতির সমষ্টিক বুদ্ধিমত্ত্বাই হবে বুদ্ধিমত্ত্বার সঠিক পরিমাপক (১)।কোন একটি প্রজাতিকে বুদ্ধিমান হতে হলে অতি অবশ্যই সেই প্রজাতিকে জটিল প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম হতে হবে। তার মতে, বিস্ময়কর জাল তৈরিতে সক্ষম বলেই মাকড়সা বুদ্ধিমান নয়। মাকড়সা তার জাল তৈরি করে মূলত সহজাত প্রবৃত্তির বশে। কাজেই সেটা প্রযুক্তি হিসাবে গ্রহনযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে, মানব প্রযুক্তি যা শুরু হয়েছিল প্রস্তরখন্ড এবং ভোতা লাঠি দিয়ে, বর্তমানে তা উন্নতির শীর্ষ পর্যায়ে পৌছে ছড়িয়ে গেছে সৌরজগতের সীমানা ছাড়িয়ে।

বহির্বিশ্বে যদি আমাদের প্রযুক্তি ছাড়া অন্য কোন প্রযুক্তির যথার্থই প্রমান পাওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রেই কেবল আমরা মেনে নিতে বাধ্য যে, এই মহাবিশে আমরা ছাড়াও বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ত্ব রয়েছে। কাজেই SETI-র অর্থই হচ্ছে, মহাবিশ্বে আমাদের ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সন্ধান করা।

সুবিশাল এই মহাবিশ্বে বুদ্ধিমত্ত্বা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু সে সম্পর্কে আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক ড্রেক (Frank Drake) ১৯৬১ সালে হাজির হয়েছিলেন একটি সমীকরন নিয়ে (২)। সমীকরনটি নিম্নরূপ,

$$N = R^* \cdot F_p \cdot N_e \cdot F_l \cdot F_i \cdot F_c \cdot L$$

যেখানে,

N= সভ্যতার সংখ্যা

R= প্রতি বছর আমাদের ছায়াপথে জন্ম নেওয়া নক্ষত্রের সংখ্যা

Fp= এই নক্ষত্র গুলোর মধ্যে যে গুলোতে গ্রহজগত আছে তার সংখ্যা

Ne= প্রতিটি গ্রহজগতের মধ্যে যে গুলোতে প্রাণের বিকাশ সম্ভব তাদের সংখ্যা

Fl= প্রাণের বিকাশ সম্ভব এমন গ্রহসমূহের মধ্যে সত্যিকারভাবে প্রাণের বিকাশ হয়েছে এমন গ্রহের সংখ্যা

Fi= প্রাণের বিকাশ হওয়া গ্রহসমূহের মধ্যে আবার যে গুলোতে বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হয়েছে তার সংখ্যা

Fc= বুদ্ধিমান প্রাণী মহাবৈশ্বিক যোগাযোগের উপায় বের করেছে এমন গ্রহের সংখ্যা

L= ঐ সমস্ত সভ্যতার গড়পড়তা আয়ুষ্কাল

ড্রেকের সমীকরনে, আমাদের ছায়াপথে প্রতিবছর জন্ম নেওয়া নক্ষত্রের সংখ্যাকে, এই নক্ষত্র গুলোর মধ্যে যে গুলোতে গ্রহজগত আছে তার সংখ্যা, যেগুলোতে প্রাণের বিকাশ সম্ভব এমন গ্রহজগতের গড় সংখ্যা , প্রাণের বিকাশ সম্ভব এমন গ্রহসমূহের মধ্যে সত্যিকারভাবে প্রাণের বিকাশ হয়েছে এমন গ্রহের সংখ্যা, প্রাণের বিকাশ হওয়া গ্রহসমূহের মধ্যে আবার যে গুলোতে বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হয়েছে তার সংখ্যা, বুদ্ধিমান প্রাণী মহাবৈশ্বিক যোগাযোগের উপায় বের করেছে এমন গ্রহের সংখ্যা এবং ঐ সমস্ত সভ্যতার গড়পড়তা আয়ুষ্কালের ভগ্নাংশ দিয়ে গুন করে N বা মহাজাগতিক সভ্যতার সংখ্যা বের করা হয়।

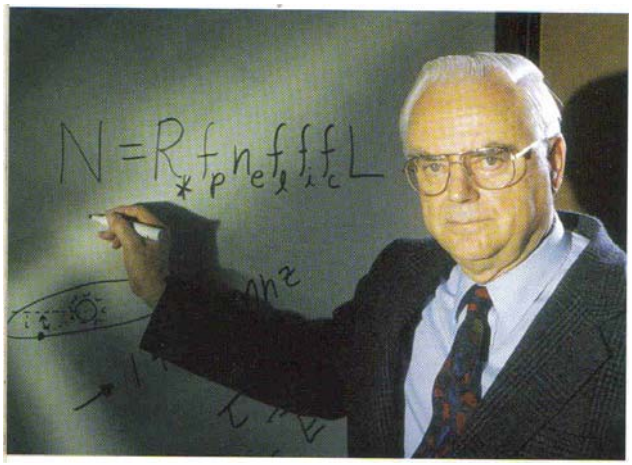

ফ্রাঙ্ক ড্রেক এবং তার বিখ্যাত সমীকরন

উদাহরন দিয়ে বিষয়টি বোঝা যাক। ধরা যাক, কোন একটি কোন স্কুলের একটি নির্দিষ্ট বছরে পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে কতজন জোতির্বিজ্ঞানী হবে তার একটি ধারণা করা হচ্ছে। মনে করা যাক, এই স্কুল থেকে প্রতিবছর এক হাজার ছাত্র পাশ করে বের হচ্ছে। এই সংখ্যাকে গুন করতে হবে এই ছাত্রদের মধ্যে যারা একদিন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে বের হবে সেই ভগ্নাংশ দিয়ে। ধরা যাক, ৬০ শতাংশ (০.৬) ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্রদের থেকে প্রতি দশজনের মধ্যে তিনজন বা ৩০ শতাংশ (০.৩) বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করবে। এদের মধ্যে হয়তো মাত্র ১১ শতাংশ (০.১১) জোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য আবেদন করবে। ধরে নিই NASA প্রতি পাঁচ বছরে একবার করে জোতির্বিজ্ঞানী নিয়োগ প্রদান করে এবং আবেদনকৃত বিজ্ঞানীদের মধ্য থেকে মাত্র এক শতাংশকে কাজে যোগদানের সুযোগ দেয়। এখন, সমস্ত সংখ্যাগুলোকে একত্রে গুন করলে পাওয়া যাচ্ছে ১ (১০০০X ০.৬X ০.৩X ০.১১X ০.০১ = ১)। অর্থাৎ এই স্কুলের পাশকৃত ছাত্রদের মধ্যে মাত্র একজনের জোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে।

পৃথিবী প্রাণের এক উর্বর বিচরনভুমি। ফল্গুধারার মতো বিকশিত হয়েছে প্রাণ এখানে। যে দিকে তাকানো যায় শুধু প্রাণ আর প্রাণ। বিচিত্র সব প্রাণের সমাহারে নন্দিত আমাদের এই বসুন্ধরা। কিন্তু সাড়ে চার বিলিওন বছর আগে জন্ম নেওয়া এই ধরনী প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাণের জন্য মোটেই বন্ধুত্বমূলক ছিলনা। প্রথম এক বিলিওন বছর বা তার কিছু সময় পর পৃথিবীতে গলিত প্রস্তর এবং এসিডের মহাসাগরে স্থিতিবস্থা আসে। জীববিজ্ঞানীরা সাড়ে তিন বিলিওন বছরের পুরনো স্তরীভূত প্রস্তর উদ্ধার করেছেন যার মধ্যে পাওয়া গেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষী 'Cyanobacteria'-র ফসিল। এই সরল প্রাণের সুদীর্ঘ বয়সই প্রমান করে সৃষ্টির মাত্র এক বিলিওন বছরের মধ্যেই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল। এতো সহজেই যদি পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটতে পারে তবে সুবিশাল এবং সুবিস্তৃত মহাবিশ্বের অন্য কোথাও যে এর বিকাশ হয়নি তার নিশ্চয়তা কোথায়।

ষাটের দশকে আমেরিকান জীববিজ্ঞানী টমাস ব্রক (Thomas Brock) এবং তার সহকর্মীরা ওয়াইওমিং এর ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের ১৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উষ্ণ- প্রস্রবনে এক ধরনের সরলাকৃতির মাইক্রোস্কোপিক মায়ক্রোবস (Microbes) আবিষ্কার করেন (৩)। বেশীর ভাগ জটিল কোষী প্রাণীই এই তাপমাত্রায় টিকে থাকতে পারতো না। যে সমস্ত 'প্রাণ' এই ধরনের ভয়ংকর বৈরি পরিবেশে টিকে থাকতে পারে তাদেরকে বলা হয় 'Extremophile'. পৃথিবীতে বেশ কয়েক ডজন 'Extremophile'-র অস্তিত্ব রয়েছে।

জীববিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সকল প্রজাতির প্রাণকে তিনটি 'Domain' এ ভাগ করেছেন । সমস্ত বৃহৎ ও জটিলকোষী প্রাণী এবং উদ্ভিদ নিয়ে গড়ে উঠেছে Eukarya. সকল এককোষী প্রাণ যাদের কোষে কোন নিউক্লিয়াস নেই তাদেরকে নিয়ে Bacteria এবং নিউক্লিয়াসবিহীন আদিম প্রাণ যাদের কোষের প্রাচীর ব্যক্টেরিয়ার থেকে ভিন্ন তাদের সমন্বয়ে Archaea. প্রতিটি Domain এর প্রজাতিসমূহ একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। তিনটি Domain-ই আবার একই উৎস থেকে এসেছে (৪)। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী এক ধরনের Extremophile-এর পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর প্র-প্র পিতামহ হওয়ার যাবতীয় বৈশিষ্টই রয়েছে (৫)। এর অর্থ একেবারেই পরিষ্কার। প্রাণের

উৎপত্তি পৃথিবীতে একবারই হয়েছে এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীই একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পৃথিবীতে প্রাণের সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং অনন্যসাধারণ উপাদান হচ্ছে ডি এন এ অনু। কয়েক হাজার পরমানুর সমন্বয়ে গঠিত হয় এক একটি ডি এন এ অনু। এই অনুর এক একটি অবিশ্বাস্যভাবে বিপুল সংখ্যক তথ্য বহন করে থাকে। ডি এন এর বৈচিত্রের কারণেই পৃথিবীতে উদ্ভব হয়েছে নানাবিধ প্রজাতির।

প্রশ্ন হচ্ছে, মহাবিশ্বের অন্য কোথাও ডি এন এর অস্তিত্ব আছে কিনা। ডি এন এ অনু যেহেতু কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইত্রোজেন, ফসফরাস এবং আরো কিছু পরমানু দিয়ে গঠিত, মহাবিশ্বের অন্য কোথাও ডি এন এর অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজন, নাইট্রোজেন বা ফসফরাসময় পরিবেশ মহাবিশ্বের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান। তবে এটাও সত্যি যে, ডি এন এর জটিল কাঠামো যা একে তথ্য বহনকারী হিসাবে তৈরি করেছে তা কিভাবে উদ্ভূত হয়েছে সেটা বলা খুবই কঠিন। কাঁচামাল সহজলভ্য হলেও ডি এন এর উদ্ভব আচমকা এবং সৌভাগ্য প্রসুত বিষয় বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে।

অবশ্য আরো একটি ভিন্ন ধরনের সম্ভাবনাও আছে। মহাবিশ্বের অন্য কোথাও হয়তো ভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভিত্তিতে ভিন্নভাবে বিকাশ ঘটেছে প্রাণের। কার্বনের পরিবর্তে অনেক বিজ্ঞানীই মহাজাগতিক প্রাণের ভিত্তি হিসাবে সিলিকনকে কল্পনা করেছেন। কার্বনের মতো সিলিকনও চারটি রাসায়নিক বন্ধন গঠন করতে পারে। যার অর্থ দাড়াচ্ছে, প্রাণের ক্ষেত্রে যেমন জড়িত রয়েছে কার্বনভিত্তিক অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া, ঠিক তেমনই একইভাবে সিলিকনভিত্তিকও অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে পারে। যদিও এই সম্ভাবনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে, পৃথিবীতে কার্বনের তুলনায় সিলিকন অনেক বেশী পরিমানে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এখানে সিলিকনভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেনি। অন্য আর একটি সমস্যা হচ্ছে, সিলিকন পরমানুর আকার কার্বন পরমানুর চেয়ে বড়। বৃহৎ এই আকৃতির কারণে সিলিকন কার্বনের মতো হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে না। যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ হাইড্রোজেন বন্ধনকে ব্যবহার করে থাকে সেগুলো সাধারণত কাঠামোগতভাবে শক্তিশালী ও নমনীয় হয়ে থাকে। সমস্ত বিষয়ের বিবেচনায়, কার্বনই জীবন গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হিসাবে বিবেচিত।

অনেক কল্পবিজ্ঞান পাঠকেরই ধারণা, বহু আগে মহাজাগতিক কোন সভ্যতার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে। আমরা হয়তো পৃথিবী নামক ল্যাবরেটরীতে তাদের সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার ফসল । কিম্বা তাদের আবর্জনা আমাদের গ্রহে ছুড়ে ফেলার ফলে এখানে বিকশিত হয়েছে জীবনের। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এধরনের ধারণাকে খুব একটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন না। তা

সত্ত্বেও মহাকাশ থেকে অন্য একটি উপায়ে পৃথিবীতে প্রাণের আগমন ঘটতে পারে। যাকে বলা হয় Panspermia (৬).

মহাশূন্যের হিমশীতল পরিবেশে কিছু সাধারণ অনু দুর্বল রেডিও এনার্জি নির্গত করে চলেছে প্রতিনিয়ত। জোতির্বিজ্ঞানীরা রেডিও টেলিস্কোপের মাধ্যমে এধরনের অনুগুলোকে পর্যবেক্ষন করে আসছেন অনেকদিন ধরেই। খুব বেশি দিন আগে নয়, বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে, সামান্য কিছুসংখ্যক পরমানুর সমন্বয়ে গঠিত সরল ধরনের অনু ছাড়া অন্য কোন অনু মহাশূন্যে থাকা অসম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের পরিসীমা রইলো যখন তারা মহাশূন্যে আবিষ্কার করলেন বিভিন্ন ধরনের আরো জটিল অনু। যেহেতু জটিল অনুর অস্তিত্ব আছে, কাজেই মহাশূন্যের গ্যাসীয় ক্ষেত্রে জীবনের মৌলিক অনুসমুহ যেমন এ্যামিনো এ্যাসিড গঠিত হওয়া খুব অসম্ভব কিছু নয়। পৃথিবী পৃষ্ঠে ভূপতিত হওয়া অনেক উল্কাপিন্ডেও একই ধরনের জটিল অনু পাওয়া গেছে। মহাশূন্যে ধূলিকনাকে আশ্রয় করে জটিল অনু থাকতে পারে এবং যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক অনু থাকে তবে তাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাও অসম্ভব নয়। যদিও মহাশূন্যের হিম ঠান্ডার কারণে এর জন্য প্রয়োজন হবে মিলিওন মিলিওন বছর।

প্রায় এক শতাব্দী আগে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী রসায়নবিদ আরহেনিয়াস (Svante Arrhenius) এবং সত্তুরের দশকে ফ্রেড হোয়েল (Fred Hoyle) এবং চন্দ্র বিক্রমাসিংহে (Chandra Wickramasinghe) মত দেন যে, জীবনের মৌলিক ধরন খুব সম্ভবত উদ্ভব হয়েছে মহাশূন্যে । উল্কাপিন্ড বা ধুমকেতুতে সওয়ার হয়ে অতঃপর ‘প্রাণ’এসে পৌঁছেছে পৃথিবীতে (৭)। পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির এই ধারণাকেই বলা হয় Panspermia. আমেরিকান বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার চাইবা (Christopher Chyba) বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীর সাগর মহাসাগরের সমস্ত জল এবং বায়ুমন্ডলের সব বাতাসই ধুমকেতু থেকে এসেছে। কারণ পৃথিবী শীতল হওয়ার আগে এতে কোন জল বা বাতাস কিছুই ছিল না (৮)।

ম্যাক্স বার্নস্টেইন (Max Bernstein) এবং জ্যাসন ডর্কিন (Jason Dworkin) নাসার ক্যালিফোর্নিয়াস্থ আস্ট্রো-বায়োলজী ল্যাবরেটরীতে এই সম্ভাবনা নিয়ে নব্বই এর দশকের শেষ দিকে কাজ শুরু করেন। বরফ এবং ন্যাপথলিনের সংমিশ্রনে তারা মহাশূন্যের কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করেন এবং মহাশূন্যে রেডিও এস্ট্রোনমারদের আবিষ্কৃত রাসায়নিক পদার্থ "Polycyclic aramatic hydrocarbons" (PAH) যোগ করেন এর সাথে। অতঃপর এর মধ্য দিয়ে ক্রমাগত চালনা করেন অতি বেগুনি তেজস্ক্রিয়তা। এর ফলে দেখা গেল যে, কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুলো আংটি আকৃতির "quinones" অনুতে পরিনত হয়েছে যা জীবন্ত কোষে প্রাপ্ত অনুর হু বহু প্রতিরূপ (৯)।

পঁঞ্চাশের দশকে রসায়নবিদ হ্যারলড উরে (Harold Urey) এবং স্ট্যানলি মিলার (Stanley Millar) শিকাগো বিশ্বাবিদ্যালয়ের গবেষনাগারে জীবনের উৎপত্তির

জন্য কোন ধরনের পরিবেশ প্রয়োজন সে বিষয়ে তাদের সুবিখ্যাত গবেষনা পরিচালনা করেন (১০)। প্রাণের উৎপত্তির আগে পৃথিবীর শৈশব অবস্থায় যে সমস্ত উপাদান বিদ্যমান ছিল তাদের একটি মিশ্রন বায়ু নিরোধক ফ্লাস্কে তারা তৈরি করেন। তারপর এর মধ্য দিয়ে শত শত ঘন্টা ধরে ইলেক্ট্রিক চার্জ, স্পার্ক পরিচালনা করেন তারা। ফ্লাস্ক খোলার পর তারা দেখতে পান যে, রাসায়নিক বিক্রিয়া সরল ধরনের অনুগুলোকে জটিল ধরনের অনুতে যেমন এ্যামিনো এ্যাসিডে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। এই গবেষনার ফলাফল গুরুত্বপুর্ন এই কারণে যে, এ্যামিনো এ্যাসিড প্রোটিন গঠনের উপাদান এবং প্রোটিনই মূলত তৈরি করে ডি এন এ। মাত্র কয়েক সপ্তাহে গবেষনাগারেই যদি এই বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটতে পারে তবে প্রকৃতিতে লক্ষ কোটি বছরে কি পরিমান পরিবর্তন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির ক্ষেত্রে পতিত উল্কাপিন্ডের সম্পর্ক থাকা পুরোপুরি অসম্ভব নয়। কিন্তু উল্কাপিন্ড শুধু পৃথিবীতেই আঘাত হানে না, অন্যান্য গ্রহেও তা টুপ টাপ ঝরে পড়ছে হর হামেশা। কাজেই অন্যান্য গ্রহেও জীবনের অস্তিত্ব থাকাকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না একেবারেই। মহাবিশ্বের অন্যত্র প্রাণের অস্তিত্ব থাকার এই তত্ত্ব জনপ্রিয় হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল ALH84001 নামের উল্কাপিন্ডটি (১১)। চার বিলিওন বছর মঙ্গলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে থাকার পর উল্কাপিন্ডটি মঙ্গল থেকে বিচ্যুত হয়ে আঘাত হানে পৃথিবীতে। ১৯৮৪ সালে এ্যান্টার্টিকার অ্যালান হিলে আবিস্কৃত হওয়া এই উল্কাপিন্ডটি গবেষনা করে ১৯৯৬ সালে নাসার বিজ্ঞানী ডেভিড ম্যাককে (David Mckay) উল্কাপিন্ডটির মধ্যেকার মাইক্রোস্কোপিক ব্যাক্টেরিয়ার ফসিলের আকৃতির ছবি তোলেন (১২)। বিজ্ঞানীদের অবশ্য কোন ভাবেই প্রমান করার উপায় নেই যে, এই আকৃতি সত্যিই মঙ্গলের ব্যক্টেরিয়ার ফসিল নাকি মাইক্রোস্কোপিক প্রস্তর গঠনের বিচিত্ররূপমাত্র।

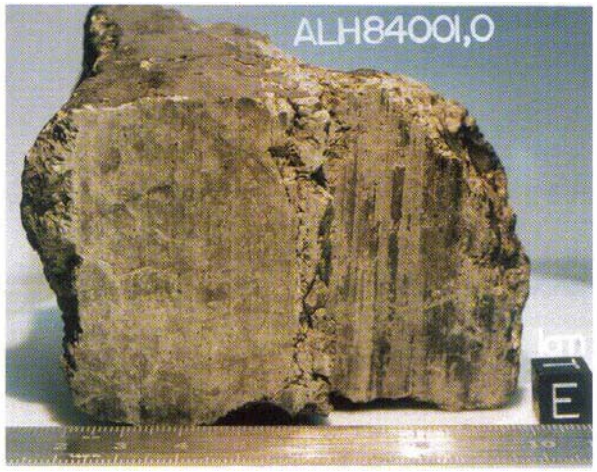

এ্যান্টার্টিকার অ্যালান হিলে আবিস্কৃত হওয়া উল্কাপিন্ড ALH84001

২০০০ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার জোতির্বিদ মার্গারেট কিভেলসন (Margaret Kivelson) ঘোষনা করেন যে, মনুষ্য বিহীন মহাকাশযান গ্যালিলিওর ম্যাগনেটিক সেন্সর বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপায় বরফের আস্তরনের নীচে জলীয় সাগরের প্রমান পেয়েছে (১৩)। জলের আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের কাছে সবসময়ই চিত্তাকর্ষক, কেননা পৃথিবীতে খুব সম্ভবত প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে পানিতে এবং প্রাণের টিকে থাকার জন্য পানির কোন বিকল্প নেই। পানি এমন একটি তাপমাত্রার সীমায় তরল অবস্থায় থাকে যেখানে প্রাণের অধিকাংশ রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হতে পারে। দুটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমানু নিয়ে গঠিত হয় পানির অনু। যেহেতু হাইড্রোজেন পরমানু দু'টি অক্সিজেন পরমানুর পুরোপুরি বিপরিত দিকে অবস্থান করে না, সে কারণে পানি Polar molecule হিসাবে বিবেচিত অর্থাৎ এটি ইলেকট্রিক চার্জ দিয়ে সামান্য প্রভাবিত হয়। এ ছাড়া জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য রাসায়নিক উপাদানগুলোর প্রায় সবই পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে। পানি ছাড়া অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়াই সম্ভব নয়।

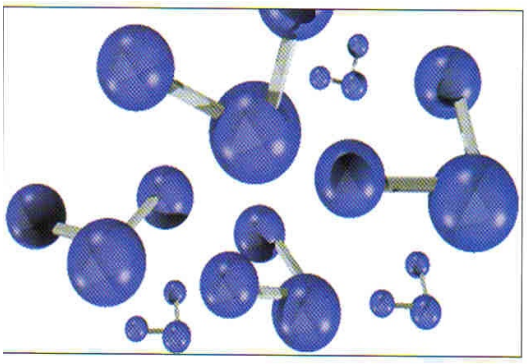

পানির অনুর রাসায়নিক গঠন

বহির্বিশ্বে মহাজাগতিক সভ্যতা আছে কিনা তা যাচাই করার সহজ পন্থা হিসাবে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে বিজ্ঞানীরা রেডিও সিগন্যালকে বেছে নেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী গুইসেপ ককনি (Giuseppe Cocconi) এবং ফিলিপ মরিসন (Philip Morrison) ১৯৫৯ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞান সাময়িকী 'Nature'-এ "Searching for Intersteller Communications" নামে একটি গবেষনা পত্রে মত প্রকাশ করেন যে, রেডিও ওয়েভ হতে পারে মহাবিশ্বে বিভিন্ন সভ্যতার যোগাযোগের সবচেয়ে কার্যকর পন্থা এবং ফলশ্রুতিতে মহাজাগতিক সভ্যতা চিহ্নিত করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বিজ্ঞানীদ্বয় ১ থেকে ১০ গিগাহার্জ রেডিও ওয়েভ বিশেষ করে ১.৪২ গিগাহার্জের রেডিও ওয়েভের কথা উল্লেখ করেন। কারণ নিরপেক্ষ হাইড্রোজেন এই ফ্রিকোয়েন্সী নির্গত করে এবং এই ফ্রিকোয়েন্সীরই ক্ষমতা আছে মিল্কিওয়ে ছায়াপথের ঘন মেঘের আস্তরন ভেদ করে যাওয়ার (১৪)। এরই ভিত্তিতে রেডিও এস্ট্রোনমার ফ্রাঙ্ক ড্রেক তার প্রজেক্ট ওজমার (Project Ozma) মাধ্যমে মহাজাগতিক বুদ্ধিমান প্রাণীর পাঠানো রেডিও ওয়েভ রিসিভ

করার চেস্টা করেন। বস্তুতঃ প্রজেক্ট ওজমাই মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্ত্বা অনুসন্ধানের সুত্রপাত ঘঠায় (১৫)।

১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম পুয়ের্টো রিকোর আরেকিবোতে (Arecibo) অবস্থিত বিশালাকৃতির ট্রানসমিটার থেকে পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিমান প্রাণীদের উদ্দেশ্যে গভীর মহাশূন্যে রেডিও মেসেজ পাঠানো হয়। ০ এবং ১ কে ব্যবহার করে সৌরজগতে আমাদের অবস্থানসহ আরো কয়েকটি তথ্য পুরে দেওয়া হয় এতে। মেসেজটি পৃথিবী থেকে একুশ হাজার আলোকবর্ষ দূরের মহাশূন্যের M13 নামে পরিচিত অসংখ্য নক্ষত্রে পরিপূর্ণ একটি ঘিঞ্জি এলাকার উদ্দেশ্যে প্রেরন করা হয় (১৬)। বিজ্ঞানীদের ধারণা যেহেতু M13 অঞ্চল হাজার হাজার নক্ষত্রে পরিপূর্ণ কাজেই সেখানে মহাজাগতিক কোন সভ্যতা থাকতেও পারে যারা হয়তো অধীর আগ্রহে রেডিও টেলিস্কোপ নিয়ে বসে আছে আমাদের বার্তার প্রতীক্ষায়।

পুয়ের্টো রিকোর আরেকিবোতে (Arecibo) অবস্থিত বিশালাকৃতির ট্রানসমিটার

১৯৭৯ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের SETI প্রজেক্ট হিসাবে "Search for Extraterrestrial Radio from Nearby Developed populations (SERENDIP)" এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮০ সালে কার্ল স্যাগান (Carl Sagan), ব্রুস মারে (Bruce Murray), এবং লুই ফ্রিডম্যান (Louis Friedman) SETI গবেষনার উদ্দেশ্যে ইউ এস প্লানেটারী (US Planetary Society) সোসাইটি গড়ে তোলেন (১৭)।

ষাট এবং সত্তুরের দশকে নাসা SETI কর্মকান্ডে হাল্কাভাবে জড়িত ছিল। ১৯৯২ সালে নাসা আনুষ্ঠানিকভাবে SETI প্রোগ্রাম শুরু করে। কিন্তু পরবর্তী বছরেই কংগ্রেস এই কার্যক্রম বাতিল করে দেয়।

নাসার SETI প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যাওয়ার পর বহু সংখ্যক নাসার প্রাক্তন বিজ্ঞানীরা ফ্রাঙ্ক ড্রেকের নেতৃত্বে SETI ইনস্টিটিউটের (SETI Institute) প্রজেক্ট

ফিনিক্সে (Project Phoenix) যোগ দেন। প্রজেক্ট ফিনিক্স রেডিও সিগন্যালের বাইরেও Drake Equation এর বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষনায় লিপ্ত হন।

SETI ইনস্টিটিউট বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের রেডিও এস্ট্রোনমি ল্যাবের সহযোগিতায় SETI গবেষনার জন্য বিশেষ এক ধরনের টেলিস্কোপ ATP (Allen Telescope Array) উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাচ্ছে (১৮)। এই টেলিস্কোপ দিয়ে 'Multibeaming" নামক এক ধরনের কৌশলের মাধ্যমে একই সাথে অসংখ্য সংখ্যক পর্যবেক্ষন অবলোকন করা সম্ভবপর ।

বার্কলের আরেকটি চমকপ্রদ উদ্যোগ হচ্ছে SETI@home যা শুরু হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। এটা এমন একটি প্রজেক্ট যেখানে যে কেউই ইচ্ছা করলেই ঘরে বসে এই প্রজেক্টে কাজ করতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজন শুধু ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি ছোট্ট প্রোগ্রাম ডাউনলোড করা। শতাধিক দেশের পাঁচ মিলিওনেরও বেশি মানুষ এই প্রোগ্রামের সাথে বর্তমানে জড়িত রয়েছে (১৯) ।

SETI গবেষনার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, কোন ফ্রিকোয়েন্সীতে রেডিও ওয়েভ ট্রানসমিট করতে হবে তা খুঁজে বের করা। যেহেতু, মহাজাগতিক বুদ্ধিমান প্রাণী কোন ফ্রিকোয়েন্সী রিসিভ করতে পারবে তা জানা নেই সেই হেতু মহাকাশের নির্দিস্ট স্থানে বিভিন্ন মাত্রার ফ্রিকোয়েন্সী ব্যবহার করতে হবে।

রেডিও সিগন্যাল রিসিভ করার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা বিদ্যমান। আমরা আদৌই জানি না কি রিসিভ করতে হবে, কেননা মহাজাগতিক প্রাণীরা কিভাবে সিগন্যাল প্রেরন করবে বা তাদের প্রেরিত তথ্য কিভাবে পুনরুদ্ধার করতে হবে সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই।

অনেক বিজ্ঞানীই আছেন যারা মনে করেন যে, SETI প্রকৃত বিজ্ঞান নয় বরং অপ-বিজ্ঞান (Pseudoscience). তাদের এহেন ধারণার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে falsifiability. কার্ল পপার (Karl Popper) বিজ্ঞান এবং অপ-বিজ্ঞানের পার্থকের মানদন্ড করেছেন অত্যন্ত সুস্পষ্ঠভাবে। পপারের ভাষায়,

> "Scientific methodology exists wherever theories are subjected to rigorous empirical testing, and it is absent wherever the practice is to protect a theory rather than to test it." (২০).

এই মানদন্ড অনুযায়ী SETI কোনক্রমেই প্রকৃত বিজ্ঞান নয়, কারণ এতে falsifiability-র অভাব রয়েছে। SETI পরীক্ষনের ইতিবাচক ফলাফল সবিস্তারে বিভিন্নভাবে প্রচার করা হচ্ছে কিন্তু এই পরীক্ষনের সংজ্ঞায়িত ব্যর্থতার শর্তসমুহ কি তা সুস্পষ্ঠভাবে বলা হচ্ছে না।

কার্ল স্যাগানও তার বেস্ট সেলার গ্রন্থ "The Demon Haunted World: Science as a Candle in the Dark"-এ falsification এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন (২১)। তিনি যুক্তি (argument) যাচাই এবং ভ্রান্ত (fallacious) ও খুঁতযুক্ত (fraudulent) যুক্তি উদঘাটনের জন্য বেশ কিছু উপায়ও বাতলে দেন যা Baloney Detection Kit নামে পরিচিত। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

> i) কর্তৃপক্ষের যুক্তি খুব সামান্যই গুরুত্ব পাবে (বিজ্ঞানে এ ধরনের কোন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব নেই)।
> ii) "Occam's razor"- যদি একই ধরনের দুটি প্রকল্প (Hypothesis) উপাত্তকে সমানভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে তবে এদের মধ্যে সহজটি গ্রহন করতে হবে।
> iii) হাইপোথেসিসকে ভ্রান্ত প্রমান করা সম্ভব কিনা। অন্য কথায় হাইপোথেসিস পরীক্ষাযোগ্য কিনা? অন্যরা একই ধরনের পরীক্ষা করলে সম ধরনের ফলাফল পাবে কিনা?

মজার বিষয় হচ্ছে, স্যাগানকেই তার প্রদত্ত প্রকৃত বিজ্ঞান গবেষনার নির্দেশনা ভংঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করা যায়। স্যাগান নিজে কর্তৃপক্ষ হয়েও SETI গবেষনার পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। এস্ট্রোনমি গবেষনা থেকে প্রাপ্ত সকল উপাত্তই রায় দিয়েছে যে, আমাদের ছায়াপথে এখনো কোন বুদ্ধিসত্ত্বার পরিচয় মেলেনি। SETI এমনই একটি বিষয় নিয়ে গবেষনা করছে যা প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে এখনো পর্যন্ত গবেষনার বিষয় হিসাবে দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি।

SETI সমর্থকরা অবশ্য এই সমালোচনাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন এই বলে যে, মূলধারার কোন বিজ্ঞানীই আজ পর্যন্ত মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্বের দাবী করেননি। বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে বা থাকার সম্ভাবনা আছে এমন কথাই শুধু বলা হয়েছে মাত্র।

মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্ত্বা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের জগতের সবচেয়ে বড় জুয়াখেলা। কেউই জানে না এই গবেষনার ফলাফল কি হবে। এখন পর্যন্ত অনন্ত মহাবিশ্বের মাত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে পরিচালনা করা হয়েছে অনুসন্ধান। বিশাল মহাবিশ্বের প্রায় পুরোটাই বলা যায় রয়ে গেছে মানুষের বোধ ক্ষমতার বাইরে । সেখানে কি আছে আর কি নেই সে সম্পর্কেই মানুষের ধারণা খুবই অপ্রতুল। বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে এই গবেষনায় শুধুমাত্র এই আশায় যে, সত্যিই যদি সাফল্য অর্জন করা যায় তবে তা হবে মানবজাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। সাফল্য

অর্জন না করলেও খুব একটা সমস্যা নেই, কেননা এই গবেষনার ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞানের এবং টেকনোলজীর যে অবিশ্বাস্য উন্নতি হচ্ছে তার সুফলও ভোগ করবে মানুষই।

References:

1. Jedicke, Peter SETI: The search for Alien Intelligence, Smart Apple Media, North Mankato, Minnesota, 2003.
2. http://www.jb.man.ac.uk/research/seti/drake.html
3. Brock, Thomas D., Life at High Temperature, History and Education, Inc, Yellowstone National Park, Wyoming, 1994.
4. http://www.ucmp.berkeley.edu/alllife/threedomains.html
5. Jedicke, Peter SETI: The search for Alien Intelligence, Smart Apple Media, North Mankato, Minnesota, 2003.
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Panspermia
7. http://www.iscid.org/encyclopedia/Panspermia
8. http://www.seti.org/site/pp.asp?c=ktJ2J9MMIsE&b=178979
9. http://www.astrochem.org/PDF/Bernsteinetal2002a.pdf
10. http://www.chem.duke.edu/~jds/cruise_chem/Exobiology/miller.html
11. http://www.lpi.usra.edu/lpi/meteorites/The_Meteorite.html
12. McKay, D., Gibson E., Thomas-Keprta, K Possible Evidence for Life in ALH84001**,** NASA/Johnson Space Center, SN, Houston, TX
13. http://www.jpl.nasa.gov/releases/2000/gleuropamagnet.html
14. Cocconi, Giuseppe and Morrison, Philip “Searching for Interstellar Communications”, *Nature*, Vol. 184, Number 4690, pp. 844-846, September 19, 1959
15. http://www.daviddarling.info/encyclopedia/O/Ozma.html
16. *http://www.seti.org/science/a-message.html*
17. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/SETI
18. *http://www.seti.org/ata/*)
19. http://setiathome.ssl.berkeley.edu/
20. http://openseti.org/OSNegadata.html
21. Sagan, Carl The Demon Haunted World: Science as a Candle in the Dark, Random House, 1996.

উইন্ডজর, অন্টারিও
farid300@gmail.com